সূচিপত্র

পরিভাষা	**১৫**
শুরুর আগে	**১৯**
ধর্ম কী?	**২৩**
খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস	২৩
অর্থনৈতিক অত্যাচার	২৯
রাজ্যশক্তির সাথে দ্বন্দ্ব	৩০
অবশেষে জেগে ওঠা : রেনেসাঁ	৪০
প্রথম আলো	**৪৪**
রিফর্মেশন	৪৪
এনলাইটেনমেন্ট	৪৬
মুসলিম বিশ্বের অভিজ্ঞতা	**৫১**
জ্ঞানের জাগরণ ও সভ্যতা নির্মাণ	৫২
ইনসাফ ও সমতাভিত্তিক সমাজ	৫৯
নাজাত ও আধ্যাত্মিকতার নতুন ধারণা	৬৬
খ্রিস্টীয় পোপতন্ত্র **vs** ইসলামি খিলাফত	৭০

চাপিয়ে দেওয়া আলো ৭৫
ডাকাতির গল্প ৭৬
ব্যবসা ৮০
শিক্ষা ৮১
শিল্প ধ্বংস ৮৬

সব টাকার খ্যালা ৮৯
আধুনিকতা ১০২
প্রশ্ন ১০৮
আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইসলাম ১১৮

বরিষে করোনা-ধারা

ন্যাকামো ১৩২
চিনলি না রে পাগলা ১৩৬
বিজ্ঞানবাদ ১৩৯
আল্লাহ কে? ১৪৩
আল্লাহর আযাবে মুসলিম কেন মরে? ১৪৭
আযাব, না ভাইরাস? ১৫৪
গযবের সাথে যুদ্ধ ১৬০
স্পর্ধানামা ১৬৫

১ম স্পর্ধা : ধর্মনিরপেক্ষতা/সেক্যুলারিজম ১৬৮
১.১ রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ১৬৮
১.২ ক্যারিয়ারে সেক্যুলার ১৭৪
১.৩ আমার আমি ১৭৯
১.৪ পারিবারিক সেক্যুলারিতা ১৮৩
১.৫ বোনদের সেক্যুলারিতা ১৮৬

২য় স্পর্ধা : পুঁজিবাদ **১৯২**

স্পর্ধা ৩ : বক্রতা, ইলহাদ **২০০**

স্পর্ধা ৪ : অশ্লীলতা **২০৬**

পাশ্চাত্য সমাজে ইসলাম **২১৬**

ঈমান-কুফর সীমান্ত **২২৭**

জরুরিয়াতে দ্বীন কী? ২৩৫

তাওয়াতুর বা ধারাবাহিকতা ২৩৬

কুরআন-ভাবনা **২৪০**

সেদিনের কথোপকথন ২৪০

তিন প্রকার মানুষ ২৪১

সুরা ফীল অবলম্বনে ২৪৭

সুরা কুরাইশ অবলম্বনে ২৪৮

সুরা লাহাব অবলম্বনে ২৫১

অসিয়ত **২৫৬**

শুরুর আগে

একদিন হঠাৎ ব্যাপারটা খুব ভাবাল আমায়। যেমন ধরেন, জ্ঞান হবার পর থেকে দেখে আসছি ৫ বছরের জন্য একজন দেশের 'রাজা' হয়, পরের ৫ বছরে আবার আরেকজন হয় ভোটে জিতে। ধরে নিয়েছিলাম, এটাই স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠতম প্রক্রিয়া, যেন এটাই হবার, এটাই হয়, এটা ছাড়া আর কিছু হবার নেই। এমনি করে ঈদের দিন সেলামি পেতাম কচকচে নতুন নোট, তা দিয়ে আইসক্রিমট্রিম কেনা চলত। যেন এটাই অনাদি কাল থেকে চলে আসা সিস্টেম, অলঙ্ঘ্য, অপরিবর্তনীয়। এই বিশেষ সুন্দর কাগজটা দিলেই দোকান থেকে অনেক কিছু পাওয়া যায়। শুক্রবার বিকাল ৩টা থেকে বিটিভিতে শুরু হতো পূর্ণদৈর্ঘ্য 'বাংলা ছায়াছবি'। অধিকাংশ সিনেমাতেই থাকত একটা আদালতের দৃশ্য। কাঠগড়া, কাঠের হাতুড়ি, অর্ডার অর্ডার... দুজন উকিল ঝগড়াঝাঁটি করে 'অবজেকশন মিলর্ড'। বিচার-সালিশের এই চিত্রটাই যেন চিরন্তন, এটা ছাড়া আর কিছু যেন হতেই পারে না।

এই যে আমাদের চারপাশে যে সিস্টেমটা আমরা দেখি, সবকিছুই একটা বিশেষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটা তো চিরটাকাল এমন ছিল না। **কোত্থেকে এলো এই বিশেষ অলঙ্ঘ্য পদ্ধতিগুলো, যাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা যায় না। যাদেরকে ছাড়া অন্যকিছু কল্পনা করা যায় না। আবার যেমন ধরেন, আমরা যে কাঠামোর ভেতরে চিন্তা করি, ঠিক-বেঠিক হিসেব করি, যা কিছুকে আমরা কাণ্ডজ্ঞান মনে করি; এগুলো এলো কোত্থেকে?** যেমন : ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি—লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়ায় চড়ে সে। বড় হতে হতে জানলাম, সবাই স্কুলে পড়ে না, অনেকে মাদরাসায় পড়ে, তারাও অনেক পড়াশোনা করে ; কিন্তু তাদের নিজের গাড়িঘোড়া

থাকে না। ভেবে দেখলাম, একটা ছেলে যা পারে, একটা মেয়ে তা পারে না। আবার মেয়েরা যা পারে, ছেলে হয়ে আমি তা পারি না ; কিন্তু আমাকে কেউ জোর করে বিশ্বাস করাতে চাইছে : একটা ছেলে যা যা পারে, মেয়েও তা পারে। মীনা কার্টুন ইত্যাদি দিয়ে **এই কথাটাকে কেউ কাণ্ডজ্ঞান হিসেবে আমার ভেতর প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।**

কেজি ক্লাসে ইসলাম শিক্ষা বইয়ে পড়লাম, সালাত পড়তে হয় দিনে ৫ বার। কিন্তু আশেপাশে বেশিরভাগ মানুষই পড়ছে না। আরো বড় হয়ে বুঝলাম 'সালাত না পড়লে কী হবে, আমার ঈমান কিন্তু ঠিকই আছে।' ২৬ বছর বয়সের আগে ধর্মকর্ম নিয়ে ভাবার ফুরসত মেলেনি। অনেকের তো শেষ বেলায়ও মেলে না, শোকর আলহামদুলিল্লাহ। কুরআনের অনুবাদ পড়তে গিয়ে দেখলাম, অনেক কিছুই আমার চেনা দুনিয়ার সাথে মিলছে না। **দুনিয়ার যে সিস্টেমটার সাথে আমি বড় হয়েছি; যা যা ধ্রুবসত্য হিসেবে জেনে, আধুনিক-ভালো-শ্রেষ্ঠ জেনে, কাণ্ডজ্ঞান হিসেবে বিনা প্রশ্নে মেনে এসেছি, তার অনেক কিছুর সাথেই কুরআন মিলছে না।** কুরআন যা বলছে, তা কেউ মানছে না। পাটিগণিতে সুদকষার অঙ্ক করানোর সময়ই বাবা বলে দিয়েছিলেন 'সুদ কী', 'সুদ ইসলামে হারাম' ইত্যাদি। তাহলে আমি করছি কেন এই অঙ্ক? তাহলে কেন তোমরা ব্যাংকে টাকা রাখছো সবাই? কোনো ক্লাসের বাংলা বইয়ে বেগম রোকেয়ার একটা প্রবন্ধ ছিল : 'পুরুষ যখন পৃথিবী-সূর্যের দূরত্ব মাপে, আমরা নারীরা তখন বালিশের ওয়ারের দৈর্ঘ্য মাপি। শকটের (গাড়ির) এক চাকা ছোট, আরেক চাকা বড় হলে সে শকট চলবে কী করে?'

» ঠিকই তো, অর্ধেক জনসংখ্যা ঘরে 'পড়ে থাকলে' জাতি কীভাবে উন্নত হবে?

» ঠিকই তো, ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠিত হয় না, বাংলাদেশের স্বাধীনতাই তার প্রমাণ।

» ঠিকই তো, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।

» ঠিকই তো, মুদ্রা তো কাগজেরই হয়। আন্তর্জাতিক লেনদেন তো ডলারেই হয়, ডলারেই হতে হয়।

» ঠিকই তো, কুরআনের যে আইন (হাত কাটা, পাথর ছুড়ে হত্যা, বেত্রাঘাত), এগুলো আজকের যুগে 'চলে না'। 'অচল, বর্বর, অমানবিক'।

» ঠিকই তো, জীবন তো একটাই। কাল হো না হো।

এরকম বহু 'ঠিকই তো'-রা এসে ভিড় করে কুরআন আর আপনার মাঝে, আল্লাহ আর আপনার মাঝে। কারা কীভাবে কখন এই 'ঠিকই তো'-গুলোকে সেট করে দিলো আমাদের মনে। ২০০১ সালেও সমকামিতাকে আমরা শতভাগ ছেলেই ঘৃণা করতাম আমাদের আবাসিক স্কুলটাতে, কেউ ধরা খেলে পুরো ব্যাচ মিলে ট্রায়ালে তোলা হতো তাকে। আজ ২০ বছরের মাথায় শুনছি অনেকেই একে স্বাভাবিক মনে করছে, পক্ষে ওকালতি করছে, বরং একে খারাপ ভাবাটাই নাকি মানসিক সমস্যা। তার মানে আমাদের 'ঠিকই তো'-র স্কেল বদলায়। গতকাল যা ঠিক, আজ তা ঠিক না। আবার গতকাল যা ঠিক ছিল না, আজ সেটাই ঠিক।

সুতরাং, মানুষের চিন্তার ইতিহাস আমাদের জানতে হবে। **কীভাবে মানুষের চিন্তাগুলো বদলে গেল, এটা না জানলে 'আজকের আমাদেরকে' আমরা চিনতে পারব না। আজকে আমাদের চিন্তাগত যে অবস্থান, সেটা প্রাকৃতিক নাকি কৃত্রিম? আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে নির্মিত? নাকি অন্য কারো অভিজ্ঞতাকে আমি আমার জন্য ধ্রুব হিসেবে মেনে নিয়েছি, যদিও আমার অভিজ্ঞতাটা ছিল ভিন্ন? আমার চিন্তার ছকটা কি আমাদের বেছে নেওয়া, নাকি কারো চাপিয়ে দেওয়া?**

সামনে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাঠক পেতে থাকবেন। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নিজেকে আবিষ্কার করতে থাকবেন। **আমি কে? আমি এমন কেন? আমি এমন করেই ভাবি কেন? কেন অন্যরকম করে ভাবি না? আমি কি স্বাধীনভাবে ভাবি, না কেউ আমার ভাবনার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে?** ইউরোপ সেই ১৬শ শতক থেকে পুরো দুনিয়া শাসন করে আসছে, আজও করছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই নেটিভদের আইন-বিচার-অর্থনীতি-শিক্ষাকে তারা নিজেদের সুবিধার্থে সাজিয়ে নিয়েছে, যেকোনো শাসক তাই করবে। নিজস্ব একটা বিশেষ পরিস্থিতির অভিজ্ঞতায় ইউরোপ একটা বিশেষ চিন্তাধারা গ্রহণ করেছে, যাকে তারা নাম দিয়েছে 'সভ্যতা' বা 'আধুনিকতা'। এটাকে একটা স্ব-আরোপিত দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছে যে, এই সভ্যতা তাকে পৌঁছে দিতে হবে সারা দুনিয়ায়—সভ্যতার দায় (White Man's Burden)। তাই ইউরোপের নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত আইডিয়াগুলো উপনিবেশ আমলে আমাদেরকে তারা মেনে নিতে পদ্ধতিগতভাবে বাধ্য করেছে, যদিও তাদের অভিজ্ঞতা আর আমাদের অভিজ্ঞতা এক নয়। সুতরাং,, **আমরা চিন্তা-কাঠামোর ক্ষেত্রে ইউরোপের অনুসারী বা উত্তরাধিকারী। ইউরোপের মতো করেই আমরা চিন্তা করি, তাদের মতো করে চিন্তা করাকে আধুনিকতা বা প্রগতি মনে করি, তাদের সমস্যার সমাধানকে নিজের সমস্যারও সমাধান মনে করি।**

ইউরোপীয় স্কেলে সবকিছু মাপতে শিখেছি আমরা, আমাদের বাবারা, তাদের বাবারা, কিন্তু কুরআন-হাদিস-ফিকহের ঠিক-বেঠিক, নৈতিকতা, আইন, সিদ্ধান্ত ইউরোপীয় স্কেলে ঠিক যায় না। তাইলে সমাধানটা আসলে কী?

» কেউ ইসলামকে ত্যাগ করে (নাস্তিক ইসলামবিদ্বেষী)
» কেউ ইউরোপীয় খাপে যেটুকু আঁটে সেটুকু রাখার পক্ষে, বাকিটুকু ছেঁটে ফেলার পক্ষে (মডার্নিস্ট রিডাকশনিস্ট মুসলিম)
» আবার কেউ ইউরোপের মনরক্ষা করে ইসলামকে পুনর্ব্যাখ্যা করার পক্ষে (মডারেট মুসলিম)

প্রথমটি তো ইসলাম থেকেই খারিজ, পরের দুটোও প্রকৃত ইসলাম নয়; বরং ইসলামের অপভ্রংশ। বহু মুসলিম সন্তান ইসলামের চিরন্তন অবস্থান ত্যাগ করে, এই ৩টিতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। **তিনটা অবস্থানেরই গোড়া এক জায়গায় : ইউরোপীয় মাপকাঠিকে ধ্রুব মেনে নেওয়া। এজন্য ইউরোপকে চিনলে নিজেকে চেনা যাবে। প্রতিটি মুসলিমের প্রয়োজন ইউরোপকে চেনা, ইউরোপের চিন্তার ইতিহাস জেনে নিজেকে প্রশ্ন করা। ইউরোপ, তুমি কার? আর আমি কার?**

ধর্ম কী?

হাজার বছর ধরে খ্রিষ্টধর্মের সাথে ইউরোপের সংসার। ধর্ম বলতে ইউরোপ তাই বোঝে খ্রিষ্টবাদকে আর মধ্যপ্রাচ্য বোঝে ইসলাম। ধর্ম নিয়ে ইউরোপের অভিজ্ঞতা আর মধ্যপ্রাচ্যের অভিজ্ঞতা পুরো ১৮০ ডিগ্রি উলটো। আমরা খুব সংক্ষেপে একটু বোঝার চেষ্টা করব কেন তাদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন।

খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাস

কথা ছিল খ্রিষ্টধর্ম কেবল বনি ইসরাইলের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে ; কিন্তু **'যীশুর জীবদ্দশায় যীশুবিরোধী'** একজন ইহুদি পণ্ডিত, যার নাম ছিল Saul, সে নিজের রোমান নাম রাখল Paul. সে ছিল রোমান রাজদরবারে 'নাগরিক' (citizen) পদমর্যাদার, এইজন্য রোমান নাম। ঈসা-নবির শোকাচ্ছন্ন সঙ্গীসাথিদের কাছে সে হুট করে উদয় হয়ে জানাল, তার সাথে ঈসা আলাইহিস সালামের মরণোত্তর দেখা হয়েছে। ঈসা তাকে বলেছেন, অ-ইহুদিদের মাঝেও সত্যধর্মের দাওয়াহর কাজ করতে। অথচ ঈসা-নবি কিন্তু বারবার সতর্ক করে বলে গেছেন—

> These twelve Jesus sent out with the following instructions : Do not go onto the road of the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. *[Matthew 10 : 5-7]*

এই বারো জনকে যীশু এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন : অ-ইহুদিদের (জেন্টাইল) রাস্তায় যেয়ো না কিংবা সামারিটান (ইহুদিদের এক গ্রুপ)-দের কোনো শহরে প্রবেশ কোরো না ; বরং ইসরাইলের হারানো ভেড়াদের (নবি ইসহাকের পথভ্রষ্ট সন্তানদের) কাছে যাও। (মানে কেবল ইহুদি ডায়াস্পোরাগুলোতে দাওয়াহ করতে বলেছেন)[১]

“

Then Jesus said to the woman, “I was sent only to help God’s lost sheep—the people of Israel.” [Matthew 15 : 24]

(এক অ-ইহুদি নারী এসেছিল সাহায্যের জন্য) তখন যীশু নারীটিকে বললেন : আমি কেবল ঈশ্বরের হারানো ভেড়াদের সাহায্য করার জন্য প্রেরিত হয়েছি—ইসরাইলের বংশধরদের প্রতি (বনি ইসরাইল)।

সেসময় বনি ইসরাইলের ১২টি গোত্র সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এজন্যই ইসরাইলের (নবি ইয়াকুবের আরেক নাম) পরিবারের হারানো সন্তান বলে সম্বোধন করা হয়েছে বারবার। পারস্য সম্রাট নেবুচাদ-নেজার (বুখতনাসর) খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৭ সালে জেরুসালেম লুট করে বাইতুল মাকদিস জ্বালিয়ে দেয়, সকল তাওরাত পুড়িয়ে দেয়, ইহুদি গোত্রগুলোকে দাস বানিয়ে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। পরে ‘ইহুদিদের ঈশ্বরে’ বিশ্বাসী পারস্যরাজ মহান সাইরাস (অনেক ঐতিহাসিক এই ব্যক্তিকেই কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন মনে করেন) তাদেরকে মুক্তি দেন, বাইতুল মাকদিস পুনর্নির্মাণ করেন। তবে ব্যাবিলন থেকে সব ইহুদি গোত্র ফিলিস্তিনে ফিরে আসেনি। অনেকে পারস্যেই থেকে যায়, কেউ এদিকপানে সরে এসে আফগান, এমনকি দক্ষিণ ভারতেও চলে আসে বলে জানা যায়। এ ছাড়া ইউরোপের বড় বড় শহরে ইহুদিরা ছড়িয়ে পড়ে (Jewish Diaspora)। মোদ্দাকথা, **ঈসা আলাইহিস সালাম বিশ্বনবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন বনি ইসরাইলের নবি।** এজন্য হাওয়ারিগণকেও[২]

---

[১] জেন্টাইল : অ-ইহুদিদেরকে জেন্টাইল বলা হয়।
সামারিটান (শমরীয়) : এরা হল বনি ইসরাইলেরই এক গ্রুপ ছিল, যাদেরকে গ্রেপ্তার করে ব্যাবিলনে দাস বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এদের দাবি, এরাই মূসা আলাইহিস সালামের মূল শরিয়তের উপরে রয়েছে। আর ব্যাবিলন ফেরত ইহুদিদের কাছে মূল তাওরাত নেই, Ezra একটা বিকৃত তাওরাত গছিয়ে দিয়েছে এদের কাছে।

[২] ঈসা আলাইহিস সালামের সহচর ও সঙ্গীদের হাওয়ারি বলা হয়।

তাদের দাওয়াতি মিশন স্পষ্ট করে দিয়েছেন : শুধু ইহুদি বসতিগুলোয় যাবে তোমরা, অ-ইহুদিদের বসতি তো দূরে থাক, ওদের রাস্তায়ও যাবে না। যেহেতু আমার দাওয়াত অ-ইহুদিদের জন্য নয়।

কিন্তু এই স্বঘোষিত শিষ্য ও 'সাবেক শত্রু' পল[১] ঈসা-নবির দাওয়াহর মধ্যে কিছু সংস্কার আনল, যার মধ্যে প্রধান হলো ঈসা আলাইহিস সালামকে ইহুদিদের নবি থেকে বিশ্বনবি ঘোষণা। পিটার[২] হলেন 'ইহুদির প্রতি প্রেরিত' (apostle to the jews) আর পল নিজেকে ঘোষণা করল 'অ-ইহুদিদের প্রতি প্রেরিত' (apostle to the gentiles), যেটা করার কথা ছিল না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, পল কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় শিষ্য ছিল না, তীব্র শত্রু ছিল ; কিন্তু এখন তাকে সরাসরি শিষ্যদের সমান মনে করা হয়। **অ-ইহুদিদের দাওয়াহ করার ক্ষেত্রে পল তাওরাতের আইনকে শিথিলভাবে উপস্থাপন করত, ক্ষেত্রবিশেষে 'অপ্রয়োজনীয়' হিসেবে। এই যেমন ধরেন—খতনা করার দরকার নেই, মদ্যপান চলবে, শনিবার পালনের দরকার নেই, শুকর খাওয়ার নিষেধ নেই ইত্যাদি।**

বস্তুবাদী মূর্তিপূজক রোমানরা পলের খ্রিষ্টীয় আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া পেয়ে আকৃষ্ট হয়। তখন একটা প্রশ্ন ওঠে : অ-ইহুদিদের খ্রিষ্টান হতে হলে আগে ইহুদি হতে হবে কি না, খৎনা, শনিবার পালন, খাবারে বাছবিচার এগুলো করতে হবে কি না। ৪৯ সালে জেরুসালেমে apostolic council-এ সিদ্ধান্ত হয়, মুশরিকরা ইহুদি না হয়েই খ্রিষ্টান হতে পারবে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে পিটার আর পলের মাঝে বিবাদও হয়, কারণ পিটার তাওরাতের শারিয়া মানা বাধ্যতামূলক মনে করতেন,

---

[১] পল বা পৌল ছিল একজন খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক। তার পূর্বের নাম ছিল শৌল। জন্ম আনুমানিক ৫ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যু ৬৪ বা ৬৭ খ্রিষ্টাব্দ। কিলিকিয়ার তার্ষ শহরে তার জন্ম, এই শহরেই সে বড় হয়। শিক্ষক গমলিয়েলের কাছে সে ইহুদিধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে। পল প্রথম জীবনে ছিল খ্রিষ্টধর্মবিদ্বেষী ও খ্রিষ্টানদের প্রতি অত্যাচারী একজন ইহুদি। পরবর্তী সময়ে সে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং তাতে নানারকম বিকৃতি ও পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের মাঝে তা প্রচার করতে শুরু করে।—শারয়ি সম্পাদক

[২] পিটারের আসল নাম ছিল সিমন (গ্রিক Σίμων) বা সিমেওন (গ্রিক : Συμεών)। পরবর্তীকালে তাকে কেফা বা পেট্রস (গ্রিক : Πέτρος) নাম দেওয়া হয়। জন্ম আনুমানিক ৩০ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যু আনুমানিক ৬৪ থেকে ৬৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। তিনি ছিলেন ঈসা আলাইহিস সালামের ১২ জন প্রেরিতের একজন এবং প্রারম্ভিক মণ্ডলীর নেতাদের অন্যতম। তাকে সাধারণত রোমের প্রথম বিশপ এবং আন্তিয়খিয়ার প্রথম কুলপিতা মানা হয়। প্রাচীন খ্রিষ্টীয় সমস্ত সম্প্রদায় পিটারকে একজন প্রধান সন্ত এবং রোমীয় খ্রিষ্টমণ্ডলি ও আন্তিয়খিয়ার খ্রিষ্টমণ্ডলির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শ্রদ্ধা করে থাকে। —শারয়ি সম্পাদক

ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা অনুযায়ী। শেষমেশ এভাবে সমাধা হয়, কেউ কারো কাজে নাক গলাবে না। এভাবে খ্রিস্টানরা দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল—

» **আলফা খ্রিস্টান : 'ইহুদীয়-খ্রিস্টান' [পিটারের অনুসারী অর্থাৎ ঈসা আ. এর আসল অনুসারী মুসলিম]**
» **বিটা খ্রিস্টান : 'অ-ইহুদি খ্রিস্টান'[পলের অনুসারী বা বর্তমান খ্রিস্টান]**

১৩৫ সালের পর থেকে বিটা-খ্রিস্টানরা হয়ে গেল মূলধারা। আর ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী সেসময়কার প্রকৃত মুসলিমরা হয়ে গেল বাতিল ফিরকা। পিটারের অনুসারী খ্রিস্টানরা এখন টিকে আছে ইহুদি ধর্মের একটা বাতিল ফিরকা হিসেবে, যাদের নাম 'নাযারিন'। আমাদের মুসলিমদের মতোই তাদের আকিদা এমন—

» আল্লাহ একক।
» ঈসা আলাইহিস সালাম সত্য নবি ও মাসিহ।
» তিনি কুমারী মারিয়াম আলাইহাস সালামের গর্ভজাত, অলৌকিকভাবে তার জন্ম।
» তাওরাতের বিধান অবশ্যপালনীয়। তবে কিছু নিজেরা যোগ করে নেয়— নিরামিষ ভোজন, স্বেচ্ছা-দারিদ্র্য, ধৌতকরণ প্রথা (ওযু টাইপ), প্রাণী কুরবানি না দেওয়া।
» সেন্ট পলকে মুরতাদ মনে করা।

খ্রিস্টান বলতে এখন থেকে আমরা বিটা-খ্রিস্টান বা সেন্টপলের অনুসারীদের বুঝব। তাওরাতের বিধান থেকে দূরে সরে গেলেও খ্রিস্টীয় ন্যায়-নৈতিকতা, মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও আধ্যাত্মিকতা ভোগবাদী রোমানদেরকে উন্নত চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পাইয়ে দেয়। মূলত তাওরাতের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ সম্পর্কিত বিধান বাদ দিলেও ব্যক্তিগত চরিত্র-আধ্যাত্মিকতা এসবে পলীয় খ্রিস্টবাদ খুব জোর দিয়েছিল। রাষ্ট্রের আনুগত্যের নীরস আচার-পার্বণ থেকে ধর্মের আনুগত্যের বর্ষণ তাদের আকৃষ্ট করতে থাকে। আবার **রোমান মুশরিক সংস্কৃতির নানান দিকও খ্রিস্টবাদে ধুমসে প্রবেশ করে: ২৫ ডিসেম্বর পালন (ছিল সূর্যদেব অ্যাপোলোর জন্মদিন, হয়ে গেল খ্রিস্টের জন্মদিন), ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর প্রভুত্ব আরোপ, আল্লাহর পুত্র মনে করা (রোমান পুরাণের কনসেপ্ট), মূর্তি তৈরি, শনিবারের বদলে রবিবার (SUN-day) বিশ্রাম দিবস— ইত্যাদি তাদের প্যাগান চিন্তাচেতনার সাথে সামঞ্জস্য**

রাখার জন্য অনুমোদিত হয়। অনেকটা শিয়াবাদের ভেতর পারসি ধর্মের উপাদান ঢুকে পড়ার মতো।

ইসলামের ভিতরও যেকোনো বাতিল ফেরকা দেখবেন অলৌকিক কিচ্ছা-কাহিনী, স্বপ্ন, পির-ফকিরের কেরামতির দলিলে প্রতিষ্ঠা পায়। তেমনি সেন্ট পলের প্রচারিত খ্রিস্টবাদ প্রতিষ্ঠিতই ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক জন্ম, অলৌকিক কার্যক্রম এবং আধ্যাত্মিক জগতের ওপর। স্বাভাবিকভাবেই অলৌকিক এসব বিষয় প্রকৃতির নিয়মনীতি ও যুক্তির বিপরীত হয়ে থাকে। ফলে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও যুক্তিপ্রয়োগের সাথে খ্রিস্টবাদের মৌলিক বিরোধ। আমরা দেখব সেন্ট পল প্রচার করছেন—

> *জ্ঞানীরা কোথায়? লেখকরা কোথায়? এ যুগের দার্শনিকরা কোথায় গেল? ঈশ্বর কি দুনিয়াবি জ্ঞানকে আহাম্মকি বানাননি? [১ কোরিন্থিয়ান ১ : ২০]*

ধর্মতাত্ত্বিক Tertullian[১] বললেন : *খ্রিস্টবাদ প্রাকৃতিক যুক্তির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণই নয় কেবল, বরং সরাসরি বিরুদ্ধে। ধর্মজ্ঞান যুক্তির বিরুদ্ধে এবং যুক্তির ঊর্ধ্বে।* তিনি সরাসরি ঘোষণা করেন : *credo quia absurdum est* (অযৌক্তিক বলেই আমি এটা বিশ্বাস করি)।[২] আজকের অনেক বোদ্ধা মুসলিমকেও এ কথা বলতে শুনবেন: ধর্ম হল বিশ্বাসের বিষয়, ধর্মে বিজ্ঞানের কোনো স্থান নেই। এর কারণ হল, **ধর্ম বলতে 'পলীয় খৃস্টধর্ম'-কেই ইউরোপ চিনেছে এবং সারা দুনিয়াকে চিনিয়েছে। ধর্ম যে যৌক্তিক হতে পারে, ধর্মের 'পার্থিব' অংশটুকু যে মানবজ্ঞানে ধরা দিতে পারে, এটা ইউরোপের কল্পনাতেই নেই।**

বৈরাগ্যবাদ

গ্রিক সভ্যতায় একটা সময় স্টোয়িকবাদ (stoicism) নামক বৈরাগ্যবাদ চর্চা হতো, যা রোমানদের হয়ে খ্রিস্টধর্মে স্থান পায়। বলা হলো : অপবিত্র পৃথিবীতে মানুষ পদস্খলিত হয়েছে আদম আলাইহিস সালামের আদিপাপের কারণে, যা লেপ্টে আছে প্রতিটি মানুষের গায়ে। সেই পাপ থেকে মুক্তি পেতে ও খ্রিস্টের প্রিয়পাত্র হতে হলে এই নশ্বর ঘৃণ্য দুনিয়ার চাহিদা, ভোগকে অবদমন করতে হবে। দুনিয়ার সম্পর্ক-সম্পদ ত্যাগ করে মঠবাসী জীবন বেছে নিতে হবে, সারাজীবন যাজক-নানরা বিয়ে করতে

---

[১] মৃত্যু : ২৪০ খ্রিস্টাব্দ

[২] James Swindal, Faith and Reason, The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP)

পারবে না। পানি ব্যবহার ত্যাগ, লাগাতার উপবাস, নিজেকে নানাভাবে অকারণ কষ্ট দেওয়া, মানবিক চাহিদাকে বঞ্চিত করা, আত্মীয়দের বঞ্চিত করে চার্চের নামে সম্পদ লিখে দেওয়া ইত্যাদির মধ্যে স্বর্গ তালাশ করতে হবে। কেন আজ ইউরোপ ধর্মকে শত্রু হিসেবে দেখে, সেটা বুঝতে হলে আমাদের এই ইতিহাসগুলো জানতে হবে। William Edward Leckey তার *History Of European Morals* গ্রন্থে সেসময়কার বৈরাগ্যচর্চার চলমান যে পদ্ধতিগুলো আমাদের জানাচ্ছেন—

» *৩০ বছর যাবৎ দিনে ১টি রুটি খেয়ে কাটানো*
» *গর্তে বসবাস ও প্রতিদিনের খাবার ৫টি ডুমুর*
» *বছরে একবার চুল কাটা, ময়লা কাপড় পরা*
» *ইচ্ছে করে মাছিকে দেহে কামড়ানোর সুযোগ দেওয়া*
» *শরীরে ৮০ পাউন্ড, ১৫০ পাউন্ড সবসময় লোহা বহন করা*
» *৩ বছর শুকনো ইঁদারার ভেতর বসবাস*
» *৪০ দিন ৪০ রাত কাঁটাঝোপে অবস্থান*
» *৪০ বছর বিছানায় গা না লাগিয়ে ঘুমানো*
» *এক সপ্তাহ যাবৎ কিচ্ছু না খাওয়া, না ঘুমোনো*
» *পানি স্পর্শ না করা। পানি ছোঁয়া, পা ধোয়া, হাত ধোয়াকে পাপ মনে করা।*
» *শরীরে এমনভাবে রশি বেঁধে রাখা যাতে শরীর কেটে পোকা ধরে যায়।*
» *১ বছর যাবৎ দাঁড়িয়ে থাকা*
» *পরিবারের সাথে আর কোনোদিন দেখা না করা*
» *চোখ ঝাপসা না হওয়া অব্দি উপোস করা*

এই আত্মা-বস্তুর পৃথকীকরণ আর অবতারবাদের গ্রিক দর্শন আর রোমান সমাজের প্রথা-পার্বণ মিলে খ্রিস্টধর্মকে যে জগাখিচুড়ি বানাল, তার সাথে ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। এই আজগুবি দুনিয়াত্যাগ মানবিকভাবে অসম্ভব প্রতিভাত হলো। ফলে সমাজে একটা অংশ অতিভোগবাদী হতে থাকল, তাও আবার চার্চের কেন্দ্রের কর্তাব্যক্তিরাও এর মধ্যে। একদিকে গির্জা-মঠে মায়া-প্রেম-চাহিদার পৈশাচিক অবদমন। আরেকদিকে শহরে পাপাচারের জোয়ার। এই অসম্ভব জীবন স্বয়ং পাদরিদের পক্ষেই বজায় রাখা সম্ভব হতো না। সেন্ট বার্নার্ড বলেছিলেন :

গির্জাকে যদি সম্মানজনক বিয়ে থেকে বঞ্চিত করা হয়, তবে তাকে অবৈধ পত্নী গ্রহণ, নিকটাত্মীয়দের সাথে যৌনসম্পর্ক এবং অন্যান্য সব অপবিত্রতা ও পাপাচারের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।[১]

তার এ কথা যাজকেরা কানেই তোলেনি। ঠিকই মঠগুলো হয়ে ওঠে গোপন কিন্তু অবাধ যৌনতার লীলাভূমি। কুমারী নারীদের সাথে সহাবস্থান ও সম্পদের অবাধ প্রবাহ স্বয়ং মঠাধ্যক্ষদেরও ইন্দ্রিয়পূজার দিকে ঠেলে দেয়। কোনো সেইন্ট ধরা খেলে পোপের পক্ষ থেকে এর শাস্তি ছিল বড়জোর অন্য মঠে বদলি বা বাধ্যতামূলক অবসর। ফলে **সাধারণ জনগণ ও রাজক্ষমতার কাছে যাজকদের মর্যাদা কমতে থাকে। ঘৃণা এমন তীব্র হয় যে, 'মঠবাসী' পরিণত হয় গালিতে** [২]।

অর্থনৈতিক অত্যাচার

রোমান ক্যাথলিক চার্চ গড়ে তোলে যাজকতন্ত্র, যার শীর্ষে পোপ। পোপ নিয়োগ দিতেন দেশে দেশে প্রধান আর্চবিশপ। আর্চবিশপের অধীনে অন্যান্য চার্চ বা মঠে বিশপ নিয়োগ হতো। এই চার্চতন্ত্র ছিল রাজা-জমিদারদের পাশাপাশি আরেক প্যারালাল ব্যবস্থা। এরা কিছু কর আদায় করত, শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করত। টাইথ, অ্যানেট ইত্যাদি বিভিন্ন নামে নানা প্রকার ধর্মীয় কর আদার করা হতো রাজা ও বিশপদের থেকে। ক্রমেই বেড়ে চলছিল এই দাবি। পোপের কোষাগারকে বলা হতো 'unbottomed sack of Rome', রোমের অতলান্ত থলে।

যাজকশ্রেণির জীবনযাত্রা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিজাতদের চেয়েও ভোগবাদী ছিল। জার্মানির এক-তৃতীয়াংশ ও ফ্রান্সের এক-পঞ্চমাংশ সম্পদের মালিক ছিল চার্চ, কিন্তু পার্লামেন্টের প্রকিউরার জেনারেল ১৫০২ সালে হিসেব করে দেখান, ফ্রান্সের তিন-চতুর্থাংশের মালিক চার্চ। ইতালির এক-তৃতীয়াংশ ভূমির মালিক চার্চ।[৩] কী একটা বিতিকিচ্ছি অবস্থা। **একদিকে দুনিয়াত্যাগের ডাক, অন্যদিকে নিজেরাই দুনিয়ার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।** শুধু কি তাই? পোপ নিজেই বিশাল এক এলাকা সরাসরি শাসন করত, যাকে বলা হতো Papal State.

---

[১] *H.E. Lea, An historical sketch of sacerdotal celibacy*, page : 331

[২] ইরেসমাস (১৫০২ খ্রিস্টাব্দ)-এর সূত্রে Cambridge Modern History.

[৩] Will Durant, *The Story Of Civilization*, page : 17

রাজ্যশক্তির সাথে দ্বন্দ্ব

এরা কেবল ধর্মীয় বিষয়েই নয়, রাষ্ট্রীয়-অর্থনৈতিক ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করত। দেশের রাজাকে পোপের অনুমোদন নিতে হতো। শুরু থেকেই চার্চ চাইছিল বিভিন্ন খ্রিষ্টান দেশের রাজা-জমিদারদের ওপর প্রভাব খাটাতে। আবার ওদিকে উলটো রাজারাও নানান ধর্মীয় বিষয়-আশয়ে প্রভাব খাটাতে চাইছিল।

- রোমান সম্রাট ৪র্থ হেনরির নিযুক্ত বিশপকে বহিষ্কার করেন পোপ ৭ম গ্রেগরি। সম্রাট পোপকে সরিয়ে দিতে চান, উলটো পোপই সম্রাটকে ১০৭৬ সালে ধর্ম থেকে বহিষ্কার ঘোষণা করে। সম্রাট তাওবা করে ফেরত আসেন। ১০৮০ সালে পোপ আবার তাকে বহিষ্কার করেন। ১০৮৪ সালে সম্রাটই পোপকে সরিয়ে দেন। কী একটা নাটক, চিন্তা করেন।

- বিশপ ও মঠাধ্যক্ষদের নিয়োগ নিয়ে জার্মান সম্রাট ও পোপের মধ্যে ৫০ বছর ধরে চলা বিবাদ শেষ হয় ১১২২ সালে Concordat of Worms-এর দ্বারা।

- আর্চবিশপ নিয়োগ দেওয়া নিয়ে ইংল্যান্ডে রাজা জন ও পোপের মাঝে দ্বন্দ্ব। ৭ বছর ইংল্যান্ডকে ধর্মীয়ভাবে বয়কটে (interdict) রাখা হয়। ১২১৫ সালে ম্যাগনাকার্টা দলিলের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে চার্চ-রাষ্ট্র সম্পর্ক সীমিত করা হয়।

- পোপ বোনিফেস দাবি করে বসেন : নাজাতের জন্য প্রত্যেককে রোমান চার্চের অধীনতা স্বীকার করতে হবে। আধ্যাত্মিক প্রধানের পাশাপাশি পোপ পার্থিব বিষয়াদিরও প্রধান। এ নিয়ে ফ্রান্সের রাজা ৪র্থ ফিলিপের সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শেষে ফিলিপ ১৩০৩ সালে পোপকে বহিষ্কার ও গ্রেপ্তার করে।

সাধারণ পাবলিকের কথাটা চিন্তা করুন। ধরুন আমাদের দেশেই সরকারের সাথে আলিম-ওলামার সংঘাতের সময় আমরা কী পরিমাণ ইনসিকিউরিটিতে ভুগি। ইউরোপীয়রা শতাব্দীর পর শতাব্দী এভাবে ভুগেছে।

জুলুমের নৈতিক অনুমোদন

এতো গেল একটা দিক। রাজার রাজত্ব ও জমিদারের জমিদারির পেছনে চার্চের নৈতিক অনুমোদন থাকত এবং লাগত। সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্ভোগ পোহাতে হতো। কোনো দণ্ড নয়, কেবল টর্চার করার জন্য কীসব যন্ত্র তৈরি

করা হয়েছিল, দেখুন। অবশ্য অধিকাংশই সহ্য না করতে পেরে মরেই যেত বলে মনে হয়। দুর্বল হৃদয়ের লোকদের দেখার দরকার নেই।

» Iron Maiden একটা শলাকাযুক্ত আলমারির মতো। ভেতরে লোক ঢুকিয়ে পাল্লা লাগিয়ে দিলেই এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেত।

» Scold's Bridle মাথায় পরিয়ে মুখরা নারীকে বাজারে ঘোরানো হতো।

» Breast Ripper দিয়ে নারীদের স্তন ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হতো।

» Heretic's Fork লাগিয়ে থুতনি গলা দুদিকেই ঢুকে যাবে ঘুমে মাথা ঝুঁকে এলেই।

» Wooden horse-এর ওপর বসিয়ে ঘোড়াকে লাফালে লিঙ্গ-যোনি-অণ্ডকোষ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।

» Spanish Boot-এর প্যাঁচ কষে পা থেঁতলে নীল করে দেওয়া হতো।[১]

ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় আদালতের নাম ছিল Inquisition. অ-ক্যাথলিক খ্রিষ্টান থেকে নিয়ে মুসলিম-ইহুদি, জোয়ান অব আর্ক থেকে নিয়ে নাইট-টেম্পলারদের বিচারের নামে নির্যাতন, হত্যার মচ্ছব চলে কয়েক শতাব্দীজুড়ে। ডাইনি-নিধনের (witch-hunt) নামে ১৪৫০-১৭৫০ পর্যন্ত তিনশত বছরে ৫-৭ লাখ মানুষ হত্যা করা হয়েছিল, যাদের ৮০% ছিল নারী। ২০০ বছরে শুধু স্প্যানিশ ইনকুইজিশনে হত্যা করা হয় ৩২ হাজার মানুষ, শাস্তি-নির্যাতন করা হয় ৩ লক্ষ জনকে।[২] অন্যান্য দেশ তো বাদই রইল।

ক্রুসেড

এরপর ধরুন, ক্যাথলিক চার্চের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইন্ধনে ২০০ বছরের মাঝে ১০টা ক্রুসেড ইউরোপ লড়েছে মুসলিম সভ্যতার বিরুদ্ধে। যা খোদ ইউরোপের জন্যই অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। ক্রুসেডের নামে একটা ব্যাপক সামাজিক অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল। কখনো মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে একের

---

[১] www.medievalwarfare.info

[২] Don Juan Antonio Llorente, a historian and bishop, who became commissary of the Holy Office (Inquisition) in 1789 William D. Rubinstein, Genocide [Routledge, 2004], 34

পর এক পরাজয়, কখনো আরেক ফিরকার খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধ ও লুটতরাজ, কখনো শিশুদের নিয়ে বাহিনী গঠন (শিশুদের ক্রুসেড ১২১২)। সালগুলো দেখুন। একই প্রজন্ম দুটো-তিনটে করে ক্রুসেড পেয়েছে কোনো কোনো বার—

ক্রম	সাল	ফলাফল
১ম ক্রুসেড	১০৯৫-১০৯৯	**মুসলিমরা পরাজিত**
২য় ক্রুসেড	১১৪৭-১১৪৯	নুরুদ্দিন জঙ্গি রাহিমাহুল্লাহর হাতে **খ্রিষ্টান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়**।
৩য় ক্রুসেড	১১৮৯-১১৯২	**খ্রিষ্টানদের** জেরুসালেম পুনরুদ্ধার অভিযান, **ব্যর্থ**
৪র্থ ক্রুসেড	১২০৩-১২০৪	**মুসলিমদের সাথে নয়,** বাইজান্টাইন রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল দখল ও লুটতরাজ করল ক্যাথলিকরা।
৫ম ক্রুসেড	১২১৬-১২২১	**খ্রিষ্টানদের** মিশর আক্রমণ এবং **মুসলিম বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ**
৬ষ্ঠ ক্রুসেড	১২২৮-১২২৯	এক চুক্তিতে ১০ বছরের জন্য জেরুসালেম খ্রিষ্টানদের শাসনে, চুক্তির মেয়াদ শেষে **মুসলিমরা পুনর্দখল করে নেয়**
৭ম ক্রুসেড	১২৩৯-১২৪১	**খ্রিষ্টান কর্তৃক** জেরুসালেম **আংশিক দখল**, ১২৪৪ সালে আবার তা মুসলিম বাহিনীর দখলে
৮ম ক্রুসেড	১২৪৯-১২৫০	মিসরের বিরুদ্ধে, খ্রিষ্টানরা **পরাজিত**
৯ম ক্রুসেড	১২৮৯	ক্রুসেডার রাষ্ট্র ত্রিপোলি দখল করে মুসলিমরা
১০ম ও শেষ ক্রুসেড	১২৯০-১২৯১	নৌবহর পাঠানো হয় শেষ ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলো রক্ষার জন্য। শেষ খ্রিষ্টান রাষ্ট্র Acre দখল করে মুসলিমরা।

একেকটা যুদ্ধ মানে ব্যাপক প্রস্তুতি, কৃষক-শিল্পীদের সেনাদলে রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং, যুদ্ধব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত কর আরোপ, সেই ব্রিটেন-ফ্রান্স-জার্মানি থেকে মধ্যপ্রাচ্য অব্দি আসা। দশ-বিশ বছর পরপরই যুদ্ধের ডাক, পরাজয়ের পর পরাজয়। সহ্যের তো আসলেই একটা সীমা আছে, ভাই।

দর্শন-বিজ্ঞানের বিরোধিতা

ঠিক যেমন খ্রিস্টবাদ মানব-চাহিদার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, একইভাবে দাঁড়িয়ে গেল প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিরুদ্ধেও। বাইবেলের ওল্ড-নিউ কোনোটাই মূল চেহারায় নেই। এটা এদের ভাষাশৈলী থেকেই বোঝা যায়। কুরআন যেমন আদেশ-নির্দেশসূচক ভাষারীতিতে। আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, 'হে মানবজাতি, এটা করো, ওটা করো না, হে নবি আপনি বলুন।' বর্তমান বাইবেলে (পুরাতন ও নতুন) বাচনভঙ্গি বর্ণনামূলক, যেন কেউ বিবরণ দিচ্ছে, গল্প শোনাচ্ছে। 'অতঃপর সদাপ্রভু বললেন...' কিংবা 'খোদাবন্দ ঈসা মসিহ পাহাড়ে উঠলেন।' ওহির সমকক্ষ তো নয়ই। হাদিসের ইকুইভ্যালেন্টও না।

যেমন ধরুন, কুরআন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে বের হতে দেরি, সাহাবিদের লিখে নিতে দেরি নেই। পড়ালেখা-জানা সাহাবিদের এক দলই ছিল 'কাতিবুল ওয়াহি' (ওহি লেখক)। তাদের কেউ না কেউ সর্বদা নবিজির সাথে থাকতেন। ওহি নাযিল হওয়ামাত্র তারা মুখস্থও করে নিতেন এবং লিখেও ফেলতেন। যে বছর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেন, সেই বছরই এক যুদ্ধে (ইয়ামামা) ৭০ জন সাহাবি শহিদ হলেন, যারা প্রত্যেকে পুরো কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। আরো জীবিত তো ছিলেন বহু। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি প্রজন্মে লক্ষ লক্ষ মানুষ ৩০ পারা কুরআন পুরোটা মুখস্থ করে রেখেছে। **শুধু লেখা হলে কিছু কিছু হারিয়ে যেত, শুধু মুখস্থ হলেও হারিয়ে যেত, বিকৃত হয়ে যেত। দুটোই একসাথে হয়েছে, ফলে এখন যে কুরআন আমরা পড়ি, তা হুবহু সেই কুরআন, যা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে বেরিয়েছে আর সাহাবিরা লিখেছেন।** এই যুদ্ধের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আর দেরি করেননি, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে পুরো কুরআন একটা বই আকারে লিখিয়ে নেন, হাফিযদের মুখস্থের সাথে মিলিয়ে, অর্থাৎ নবিজির মৃত্যুর ঠিক পরের বছরই। পরবর্তী সময়ে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু সেটাকে ৭টা কপি করে নানান প্রদেশে পাঠান, সেই কপিগুলোর ২/৩টা আজও আছে। মানে **সবচেয়ে প্রাচীন কপি নবিজির ওফাতের ১৫ বছরের মাঝে লেখা। আর এই ১৫ বছরের মাঝে মূল একটা কমপ্লিট কপি তো ছিলই, সাথে ছিল হাজারো হাফিয সাহাবি-তাবিয়ি।**

বিপরীতে কট্টর ইহুদিদের দাবি মতে তাওরাত নাযিল হয়েছে ১৩১২ খ্রিস্টপূর্ব, পরের ৪০ বছরব্যাপী লিপিবদ্ধ হয়। কম কট্টরদের মতে, কয়েক শতাব্দী ধরে লেখা

হয়, লেখকও বেশ কয়েকজন; কিন্তু বর্তমানে প্রাপ্ত তাওরাতটি ৪৫০-৩৫০ খ্রিষ্টপূর্ব সময়ে রচিত। ৫৮৭ খ্রিষ্টপূর্ব সালে পারস্য সম্রাট নেবুচাদ-নেজার জেরুসালেম লুট করে ধুলোয় মিশিয়ে দেন, বাইতুল মাকদিস পুড়িয়ে দেন, ইহুদিদের দাস বানিয়ে ব্যাবিলনে নিয়ে যান। তাওরাত হারিয়ে যায়। ৪৮৭ খ্রিষ্টপূর্ব সালে Ezra (উযায়ের আলাইহিস সালাম) তাদেরকে জেরুসালেমে আবার নিয়ে আসেন এবং বর্তমান তাওরাত দিয়ে বলেন, এটাই মুসা-নবির তাওরাত [১]। মোদ্দাকথা, ওল্ড টেস্টামেন্ট ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন গ্রন্থ। এর লিখন-সংরক্ষণ-ধ্বংস-পুনরাবিষ্কার মিলিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এই তাওরাত সেই মুসা আলাইহিস সালামের মুখনিঃসৃত ওহি কি না।

আবার ধরুন নিউ টেস্টামেন্ট। একটা বিরাট অংশ তো শিষ্যদের লেখা চিঠিপত্র। স্বাভাবিকভাবেই সেগুলো ওহি নয়, যা নবিদের ওপর নাযিল হয়। পুরো নিউ টেস্টামেন্টের সবচেয়ে প্রাচীন কপি (চিঠিগুলোসহ) ৩৬৭ সালের। ৪টা গসপেল মূলত যীশুর জীবনী, যেমন আমাদের নবিজির সিরাহ, কিন্তু পার্থক্য হলো, **আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাহও সরাসরি তার সাহাবিদের বর্ণিত। কিন্তু ৪টা গসপেল-লেখকের কেউই ঈসা-নবির সাহাবি (হাওয়ারি) নয়।** New Oxford Annotated Bible জানাচ্ছে—

---

[১] এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, উযাইর আলাইহিস সালাম তো নবি ছিলেন। তাহলে তিনি যখন তাওরাতের কপি দিয়ে বললেন, এটাই মুসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিলকৃত তাওরাত, তাহলে তো তার কথা বিশ্বাস করতেই হবে। কারণ তিনি ছিলেন নবি, আর নবিগণ কখনো মিথ্যা বলেন না। তাদের কথা ও কাজে থাকে সরাসরি আল্লাহর সাহায্য-সমর্থন। তাই নবি উযাইর আলাইহিস সালাম বর্তমান তাওরাতকে অবিকৃত তাওরাত বলে অভিহিত করায় প্রমাণ হলো যে, এটাই সে তাওরাত, যা মুসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল হয়েছিল

এটার উত্তরে আমরা বলতে পারি, উযাইর আলাইহিস সালাম নবি কি না, সে ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। নিঃসন্দেহে তিনি ইহুদিদের মধ্যে অত্যন্ত নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তার নবি হওয়ার বিষয়টি অকাট্য নয়। সহিহ সনদে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার জানা নেই যে, উযাইর নবি কি না।' [*সুনানু আবি দাউদ* : ৪৬৭৪] অতএব, তার নবি হওয়ার বিষয়টি যেহেতু সুনিশ্চিত নয়, তাই মুসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত প্রমাণিত বিশুদ্ধ সনদ ছাড়া শুধু তার কথার ওপর নির্ভর করে তাওরাতের বিশুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব নয়। অতএব, বর্তমানের তাওরাত গ্রন্থটি মুসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিলকৃত সেই অবিকৃত তাওরাত কি না, সে ব্যাপারে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। মোটকথা, অকাট্যভাবে কেউ বর্তমানের তাওরাতকে মুসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিলকৃত প্রকৃত তাওরাত বলে প্রমাণ করতে পারবে না।—শাররিয় সম্পাদক

সার্বিকভাবে পণ্ডিতরা একমত যে, গসপেল ৪টি যীশুর মৃত্যুর ৪০-৬০ বছর পরে লেখা। যীশুকে স্বচক্ষে দেখা বা সামসময়িক কারো লেখা নয়।

কট্টর খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকদের মতেও এগুলো সবই ৭০ সালের আগে লেখা। অন্যদের মতে, ৭০-১০০ সালের মাঝে লেখা। কুরআনের সাথে তুলনা তো সম্ভবই নয়, দেখা যাক হাদিসের সাথে তুলনা চলে কি না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জীবদ্দশায় হাদিস লিপিবদ্ধ করার হুকুম দিয়েছিলেন। প্রথমে কুরআনের সাথে মিশে যাবার আশঙ্কায় মানা করেছিলেন। কিছুদিন পরে যখন কুরআনের ভাষাশৈলী ও নবিজির বাচনশৈলীর পার্থক্য সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন অনুমতি দিয়েছিলেন। অনেক সাহাবির স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি (ডায়েরি) ছিল, যা পরে বর্তমান হাদিসগ্রন্থগুলোয় আত্মীকৃত হয়েছে। যেমন :

» আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার আস সহিফাতুস সাদিকাহ (নির্ভুল পাণ্ডুলিপি)

» আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিফা (পাণ্ডুলিপি)

» আমর ইবনু হাযম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় নবিজির লিখিত নির্দেশনামা

» সামুরা ইবনু জুন্দুব রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাণ্ডুলিপি

» সাদ ইবনু উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিফা

» জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুমার (হজের হাদিস-সংক্রান্ত) সহিফা

» মুগিরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাজমুআ (সংকলন)

» আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুসনাদ (*সুনানুদ দারিমিতে* উল্লেখ আছে)

» আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এক শিষ্যকে দেওয়ার জন্য ১৫০ হাদিসের সংকলন করেন

» আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুমার সহিফা (*মুসতাদরাক লিল হাকিম*-এ উল্লেখ আছে)

» আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিফা (একউট পরিমাণ বই)

» আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিফা

» নুবাইত ইবনু শারিত রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিফা (যাহিরিয়া লাইব্রেরিতে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে এবং এর একাংশ *মুসনাদু আহমাদে* উল্লেখ আছে।)

» জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে ১৫৪০টা হাদিস লিখে নেন ওয়াহব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ

» আম্মাজান আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার হাদিসগুলো লিখে নেন উরওয়া রাহিমাহুল্লাহ

এসব পাণ্ডুলিপির উল্লেখ পরবর্তী নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। এসব সংকলনের হাদিসগুলো পরে বর্ণনা পরম্পরাসহ বর্তমানে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলোয় আত্মীকৃত হয়েছে যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর '*আস- সহিফাতুস সাদিকাহ*' পুরোটাই আছে *মুসনাদু আহমাদে*। অন্যান্য সহিফার হাদিসগুলোও *মুসনাদু আহমাদ, মুসতাদরাকুল হাকিম, সুনানুদ দারিমি, সুনানুল বাইহাকি*-সহ বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে ধারাবাহিক সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ **আমাদের হাদিসগুলোর একটা বর্ণনা পরম্পরা আছে, নিরবচ্ছিন্ন, কোনো ফাঁক নেই, গ্যাপ নেই, হারিয়ে যায়নি কিছু। যারা হাদিস লিখেছেন, তারা সবাই সাহাবি, স্বচক্ষে দেখেছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। আমাদের নবিজির হাদিস-সিরাহতেও বর্ণনাকারীর পরম্পরা-চেইন (সনদ) রয়েছে, যা সরাসরি নবিজির মুখ পর্যন্ত পৌঁছে,** কিন্তু গসপেলের সংরক্ষণ-লিখন এমন নয়, লুক যদি এভাবে লিখতেন : আমি শুনেছি আমার উস্তায সেন্টপলের কাছে, সে শুনেছে হাওয়ারি থমাসের মুখে, যীশু বলেছেন...। তাহলে আমাদের সিরাহ-হাদিসের সাথে একটা তুলনা দেওয়া যেত। **ইসলামি সনদের শর্তে ফেললে, বাইবেল হয়তো মওযু/ মুনকার (জাল-প্রত্যাখ্যাত) বা টেনেটুনে সনদবিহীন মাজহুল (অজ্ঞাত) একগাদা রাবি (বর্ণনাকারী) বর্ণিত ইতিহাস গ্রন্থের মর্যাদা পাবে, কিন্তু সেই আদি ওহির ঢঙে সুরিয়ানি ভাষার ইনজিল এখন দুনিয়ার বুকে নেই। নেই ওহির ঢঙের তাওরাতও**[১]।

যেহেতু মানুষের রচনা, বিকৃত বাইবেলে এমন অনেক মনগড়া বিবরণ রয়েছে, যা বাইবেল লেখকেরা সেসময়ের আন্দাজে লিখেছেন। পরবর্তী সময়ে প্রকৃতি

---

[১] আরামায়িক (সুরিয়ানি) ভাষার বাইবেল যেটা পাওয়া যায়, সেটা গ্রিক নিউ টেস্টামেন্টেরই (ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনী টাইপ) সুরিয়ানি অনুবাদ। মূল সুরিয়ানি ইনজিল নেই। আর ইবরানি (হিব্রু) ভাষার তাওরাত রয়েছে যা ইতিহাস গ্রন্থের মতো বিবরণমূলক, ওহির মতো নির্দেশমূলক না

পর্যবেক্ষণের সাথে এগুলো সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। তখন প্রকৃতিবিজ্ঞান ছিল দর্শনেরই অংশ (Philosophia Naturalis) আর দর্শনচর্চা নিষিদ্ধ ছিল সেই ৭ম শতক থেকেই। John Malalas[১]-এর লেখা (*Chronographia*) থেকে জানা যায়: এথেন্সে পাঠানো হয় সম্রাট ডিসিয়াসের ফরমান, কেউ ফিলোসফি শেখাবে না...।[২] সেন্ট অগাস্টিনের জবানে, দার্শনিকদের মতগুলো 'সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ও দমিত হয়েছে'। ৬০০ সালের আগেই ৯০ % ক্ল্যাসিকাল টেক্সট আর ৯৫ % ল্যাটিন রচনা হারিয়ে গেল কালের গর্ভে।

'ইনকুইজিশন' আদালতের মাধ্যমে দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের 'ধর্মহীন' সাব্যস্ত করে দণ্ডিত করা হতো ডাইন হিসেবে, গুপ্তচর্চা করার অপরাধে। দেখা যাক, এই তালিকায় কারা কারা ছিল।

নাম	পরিচয়	শাস্তি	চার্চের অভিযোগ
রজার বেকন	দার্শনিক-বিজ্ঞানী	অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যু	নতুন মতবাদের কারণে (imprisoned for 'suspected novelties'.)
Pietro d' Abano	ইতালীয় দার্শনিক, মেডিসিনের অধ্যাপক	কারাগারে মৃত্যু। মৃত্যুর পর দণ্ড হিসেবে হাড় পোড়ানো হয়।	গুপ্তবিদ্যাচর্চা
Cecco d' Ascoli	ইতালীয় চিকিৎসক ও গণিতজ্ঞ। জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক (University of Bologna)	পুড়িয়ে হত্যা	প্রেতচর্চা

[১] মৃত্যু : ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ

[২] Paavo Castren (ed.), Post Herulian Athens AD 267-529.

Michael Servetus	স্পেনীয় চিকিৎসক, ধর্মজ্ঞ, ভূতাত্ত্বিক	মৃত্যুদণ্ড	ত্রিত্ববাদ অস্বীকার (একত্ববাদী ছিলেন)
Girolamo Cardano	গণিতজ্ঞ, পলিম্যাথ	কারাদণ্ড	ছাত্রদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগ (পোপ পরে ক্ষমা করেন)
Giordano Bruno	গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও কবি	পুড়িয়ে হত্যা	যীশুর দেবত্ব অস্বীকার, বিশ্বকে অসীম দাবি, ত্রিত্ববাদ অস্বীকার, চার্চকে গালমন্দ, যাদুবিদ্যাচর্চা ইত্যাদি
Lucilio Vanini	দার্শনিক ও চিকিৎসক	জিহ্বা কর্তন ও মৃত্যুদণ্ড	ব্লাসফেমি
Galileo	বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ	কারাদণ্ড	ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে নতুন সম্পর্ক নির্মাণ যে, ধর্ম পর্যবেক্ষণের অধীন হতে হবে, এই বক্তব্য
Copernicus	পোলিশ যাজক ও জ্যোতির্বিদ	চাপপ্রয়োগ	সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ

ইতিহাসবেত্তা Will Durant-এর মতে, কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ (পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে) ছিল খ্রিষ্টবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। চার্চের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে কোপার্নিকাস নিজের ভুলের সম্ভাবনা মেনে নিয়ে মতের পরিমার্জন করে সে যাত্রা রক্ষা পান।

শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

ক্রুসেডের পর এলো শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। **২০০ বছর মুসলিমদের সাথে, এবার ১০০ বছর নিজেদের সাথে নিজেরা।** ১৩৩৭-১৪৫৩ সালব্যাপী ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মাঝে চলতে থাকে দফায় দফায় যুদ্ধ। ফ্রান্সের সিংহাসনে কে বসবে, তা নিয়ে। জমিদারতন্ত্র আর পোপতন্ত্রের জাঁতাকলে ইউরোপের আসলেই শোচনীয় দশা।

বুবোনিক প্লেগ

এরই মাঝে এলো কালোমরণ। ১৩৪৭-১৩৫২ সালের বুবোনিক প্লেগ মহামারিতে শুধু ইউরোপে মারা যায় আড়াই থেকে ৪ কোটি মানুষ। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। ইউরোপ-আফ্রিকা-এশিয়া মিলে মারা যায় বহু মানুষ, কেউ বলে ৭ কোটি, কেউ বলে ২০ কোটি। **পোপতন্ত্রের ঐশী ক্ষমতা নিয়ে জনমনে সন্দেহ জন্মে, এদের দিয়ে না রোগ থামছে, আর না মৃত্যু। যাজকেরাই দলে দলে মারা যাচ্ছে** (যেহেতু তারা চিকিৎসার জন্য, মৃত সৎকারে এগিয়ে যাচ্ছিল)। ১৩৪৯ সালের দিকে ইংল্যান্ডের ৪৫% আর বার্সেলোনার ৬০% পাদরি মারা পড়ে।[১] বয়ান দেওয়া হচ্ছিল যে, আমাদের পাপের শাস্তি এই প্লেগ। আবার যাদের নিষ্পাপ ভাবি, সেই পাদরিই অর্ধেক মারা গেল। তাহলে এরা যা বলেছে, তা তো মিলছে না।

আবার চাবুকধারী আন্দোলন (Flagellate Movement) শুরু হলো। ধরেন কয়েকশো লোক শহরে শহরে ঘুরবে শোকসংগীত গাইতে গাইতে। প্রধান চার্চের সামনে কান্নাকাটি, গুনাহ মাফের দুআ করবে সবার পক্ষ থেকে, চিৎকার-বিলাপ-পোশাক ছিঁড়ে-নিজেকে চাবুক দিয়ে পেটাবে। কেটে রক্তাক্ত করে ফেলবে নিজেদের। শেষে সবাই ক্রুশের আকার ধরে পড়ে থাকবে। জনগণ ঘিরে দেখতে থাকবে। এদের নেতা শেষে উপস্থিত সবাইকে তাওবার আহ্বান জানাবে। এদেরকেও পোপ 'গোমরাহ' ফাতোয়া দিয়ে দিলো, বেচারারা সবার পক্ষে থেকে তাওবা করছিল। এসবের দরুন দিনকে দিন খ্রিষ্টান জনগণের ওপর চার্চ প্রভাব হারাচ্ছিল।

Western Schism

১৩৭৮ থেকে ১৪১৭ সাল অব্দি চলে আরেক নাটক। ৩ জন ব্যক্তি নিজেকে 'আসল পোপ' দাবি করতে থাকে। ১৪২৯ সাল পর্যন্ত বিভক্ত হয়ে থাকে ক্যাথলিক চার্চ। এইগুলা কি সহ্য হয় বলেন?

সব মিলিয়ে ধর্মের ব্যাপারে ইউরোপের অভিজ্ঞতাটা আসলেই ভয়াবহ। ইউরোপ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। সর্বত্র খ্রিষ্টবাদের অন্যায় হস্তক্ষেপ জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ইউরোপ সাধে কি সেক্যুলারিজমের দিকে ঝুঁকেছে? মানব-রচিত

---

[১] John Aberth, ed. The Black Death : The Great Mortality of 1348-1350 : A Brief History with Documents (New York : Bedford/St. Martin's, 2005), 107

খ্রিস্টবাদের সাথে ইউরোপের হাজার বছরের সংসার। শেষ পেরেকটা ঠুকে দিলো মুসলিমদের হাতে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন।

কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন

১৪৫৩ সালে উসমানি খলিফা মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের হাতে পতন ঘটে খ্রিস্টবাদের অন্যতম ঘাঁটি কনস্ট্যান্টিনোপলের। এসব এলাকা থেকে অনেক গ্রিক পণ্ডিত ইতালি চলে আসে, যাদের হাত ধরে ইউরোপে ফিরে আসে হারিয়ে যাওয়া গ্রিক-রোমান রচনা। ইতালিতে গ্রিক ভাষা, মূল গ্রিক বাইবেল চর্চা, রোমান দার্শনিকদের (Cicero, Lucretius, Livy, Seneca) দর্শনচর্চা বেড়ে চলে। ফ্লোরেন্সে আবার গড়ে ওঠে সেই ৫৩২ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া নিও-প্লেটোনিক স্কুল।

অবশেষে জেগে ওঠা : রেনেসাঁ

ইউরোপের চিন্তার পরিবর্তনে মূল অবদান আরবদের।[১] প্যাগান গ্রিক দর্শনকে যাজকেরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। **কিন্তু মুসলিমরা যখন সেই গ্রিক দর্শনকে একেশ্বরবাদের সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করলেন, সেটাই হয়ে উঠল ক্যাথেড্রাল স্কুলগুলোর পাঠ্য।** ১৩২৫ সালের মাঝে University of Paris-এর কারিকুলামে আবার এরিস্টটল ফিরে আসে এই শর্তে যে, এরিস্টটলের যেটুকু ইবনু রুশদ গ্রহণ করেছেন, সেটুকুই পাঠ্য হবে।[২] যুক্তিপ্রিয় ও সুফিবাদী উভয় প্রকারের পাদরিদের জন্য দর্শনশাস্ত্র গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

রোমান ক্যাথলিকদের মাঝে সেসময় ছিল দুই ফিরকা : ডোমিনিকান আর ফ্রান্সিসকান। ডোমিনিকানদের কথা ছিল, যা-ই হোক আর তাই হোক, যুক্তি চলবে না। খ্রিস্টবাদ হলো সর্বান্তকরণে বিশ্বাস। বার্সেলোনা শহরে তাদের ১২৯৯ সালের প্রোভিন্সিয়াল চ্যাপ্টারে (দাওয়াতি সম্মেলন) বিজ্ঞান পড়ার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি জারি করা হয়। বলা হয় —

> *বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের অবস্থান হলো, আমাদের ভ্রাতৃসংঘের কেউ মেডিসিন বা দুনিয়াবি যুক্তিবিদ্যা চর্চা করবে না। যা কিছু আমাদেরকে দুর্বল*

---

[১] বিস্তারিত জানতে লেখকের *কাঠগড়া* বইটি দেখতে পারেন

[২] Rashdall, Universities, i.368 সূত্রে The Legacy of Islam, Page. 276

করে, বিতর্কিত করে এমন সবকিছু পরিহারে আমাদের দ্বিধা নেই। এইসব বিষয়ের বইপত্র ছাড়াই আমরা এগিয়ে যাব।[১]

আর প্রচলিত ধর্মতত্ত্বের বাইরে গিয়ে ফ্রান্সিসকানদের কথা ছিল, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের দ্বারা স্রষ্টার মহিমা উপলব্ধি করা। ক্যাথেড্রাল স্কুলের এই যাজক-পণ্ডিতদের হাতেই দর্শন ও প্রকৃতিবিজ্ঞান চর্চা আবার শুরু হয় ইউরোপে। ফ্রান্সিসকান পাদরিদের এই চেতনাকে বলা হচ্ছে 'প্রোটো-রেনেসাঁ' বা প্রাক-রেনেসাঁ। অক্সফোর্ড ছিল এই পাদরিদের চার্চস্কুল। ১২৩০ সালে বিশপ রবার্ট গ্রসটেস্ট প্রকৃতিদর্শনের ওপর ক্লাস শুরু করেন এখানে, যোগ দেন সিলসিলার সভ্য (ফ্রায়ার) রজার বেকন। **তাহলে ১৩৫০-এর ঠিক আগে ইউরোপের হাতে রয়েছে—রোমান আইনের বিস্তৃত বইপুস্তক, আরবীয় মেডিসিন, এরিস্টটলীয় যুক্তি ও প্রকৃতিবিজ্ঞান (আরবি ব্যাখ্যা), গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা (আরবি-টু-ল্যাটিন অনুবাদ), লিখন-বর্ণমালা ও লেখ্যভাষা-অলংকার এবং ল্যাটিন কবিতার ভান্ডার।**[২] **এসব চর্চা করে রেনেসাঁর আগেই খ্রিষ্ট-ইউরোপে দাঁড়িয়ে গেছে বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় —**

- ইতালিতে সালের্নো মেডিকেল স্কুল (১০৭৭), বোলোগনা (১০৮৮), পদুয়া (১২২২), রোম বিশ্ববিদ্যালয় (১৩০৩), ফ্লোরেন্স (১৩২১)
- ইংল্যান্ডে অক্সফোর্ড (১১৬৭), কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (১২০৯)
- ফ্রান্সে প্যারিস (১১৫০-১১৭০), মন্টপিলিয়ার (১২২০), তুলোঁ (১২২৯)
- স্পেনে স্যালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয় (১২১৮)
- মধ্য ইউরোপে প্রাগ (১৩৪৮) ও ভিয়েনা (১৩৬৫)

ইউরোপে রেনেসাঁ (১৩০০-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ) বা নবজাগরণের আঁতুড়ঘর তো এগুলোই। শুরুটা যাজকদের হাত ধরে হলেও **এই ইউনিভার্সিটিগুলোতে তৈরি হয়েছে অযাজক পণ্ডিতরা। গ্রিক-মুসলিম জ্ঞান-দর্শনের প্রভাবে শিক্ষিত-চিন্তক অযাজক সম্প্রদায় গড়ে ওঠাই ইউরোপের রেনেসাঁর কারণ।**

---

[১] (Douais, "Acta Capitulorum Provincialium O. P.," Toulouse, 1894, Page. 648, No. 14) সূত্রে John M. Lenhart (1924). Science In The Franciscan Order : A Historical Sketch. Franciscan Studies, (1), 5–44.

[২] Paul Oskar Kristeller, Renaissance Thought, 1961

এই পণ্ডিতদের মাঝেই পাবেন ভবিষ্যৎ রেনেসাঁর জনক Petrarch[১] আর Giovanni Boccaccio.[২] তাদের হাত ধরে ইতালিতে শুরু হলো এক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন—'হিউম্যানিজম', যাকে বলা যায় রেনেসাঁর প্রাণভোমরা। Gianozzo Manetti, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Lorenzo Valla এবং Coluccio Salutati-দের মাধ্যমে গ্রিক ও রোমান মূল্যবোধগুলো পুনর্পাঠ ও চর্চা চলতে থাকে। প্রধান চেতনাগুলো ছিল—

» **এই বিশ্বের কেন্দ্রবস্তু মানুষ নিজে [সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই, আগে মানুষ হন]। মানুষের জ্ঞান, মানুষের অর্জন, মানুষের জীবনই সত্য। (কোনো স্রষ্টা-স্রষ্টাপুত্র-পরকাল নয়)**

» **মানবতার মর্যাদা : বিশ্বাসের অনুতাপে পুড়ে নাজাতের মাঝে মর্যাদা নেই (খ্রিষ্টবাদের চেতনা); বরং সংগ্রাম ও প্রকৃতিকে জয় করাতেই মানুষের মর্যাদা।**

» **মনের ওপর জেঁকে বসা বিদেশি মতবাদের (খ্রিষ্টবাদ ইউরোপে বিদেশিই) শেকল ভেঙে মুক্তচিন্তা ও সমালোচনা।**

ইউরোপে চিন্তার এই নবজাগরণকেই বলা হয় রেনেসাঁ (নবজন্ম)। দীর্ঘ এক হাজার বছরের অবরুদ্ধ মনন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে নতুন করে ভাবতে শিখল। ঠিক কবে থেকে রেনেসাঁ শুরু হলো, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলছেন ১৩০০-১৬০০ পর্যন্ত, কেউ বলেন ১৩৫৮-১৬৫৮ পর্যন্ত; আবার কেউ বলছেন ১৪৫৩-১৫২৭ সময়টুকুই আসলে মূল জাগরণ হয়েছে। মধ্যযুগের বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে খ্রিষ্ট-ইউরোপ এখন প্রবেশ করছে আধুনিক যুগে। **রেনেসাঁ শব্দের অর্থই 'নবজন্ম'। বিদেশি খ্রিষ্টবাদ পরিহার করে ইউরোপের নিজস্বতায় (ক্ল্যাসিকাল) ফিরে যাওয়াকে বলা হচ্ছে পুনর্জন্ম। ক্ল্যাসিকাল অর্থ গ্রেকো-রোমান সভ্যতা, যা ইউরোপের নিজস্বতা, খ্রিষ্টবাদ তো ইউরোপের বাইরের জিনিস।**

সাহিত্য, কবিতা, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য ইত্যাদির মাধ্যমে এই চেতনাগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল। অনেক ইতিহাসবিদ রেনেসাঁকে ir-religion বা un-christianizing বলেছেন। ধর্মের ব্যাপারে গ্রেকো-রোমান সর্বজনীন natural religion (এক জাতীয়

[১] মৃত্যু : ১৩৭৪

[২] মৃত্যু :১৩৭৫

সর্বেশ্বরবাদ) প্রোমোটকারী আলোচনাও নিজে থেকেই চলে আসে। ১৪৩৬ সালের দিকে গুটেনবার্গ আবিষ্কার করেন ছাপাখানা। যার ফলে রেনেসাঁর চেতনা ছড়িয়ে যায়। নাটক-সাহিত্য-কবিতা-চিত্রকর্মের মাধ্যমে ব্যাপকতা লাভ করে। বাইবেলও ব্যাপক মুদ্রণের ফলে হাতে হাতে পৌঁছে যায়। একসময় চার্চই বাইবেল ব্যাখ্যার অধিকার রাখত। ক্যাথলিকদের বহু ব্যাখ্যা প্রশ্নবিদ্ধ হতে লাগল শিক্ষিত মানুষের কাছে। যাকে পরবর্তী সময়ে আমরা প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন হিসেবে দেখব।

এভাবেই যাজকদের অনৈতিকতা, শতাব্দীর পর শতাব্দী ডাইনি-নিধন, বুবোনিক প্লেগ, চার্চ-সমর্থিত সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার, ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ ইউরোপ চিনেছে ধর্মকে শত্রু হিসেবে। বিকাশ, জ্ঞান, চিন্তা, মুক্তি, জীবনের বাধা হিসেবে। কীভাবে বাঁচবে ইউরোপ? কোন সে রাস্তা যা ইউরোপকে দুদণ্ড শান্তি দেবে? কোন সে আলো যা পথ দেখাবে আঁধারে বন্দি ইউরোপকে?